জাতীয় নগরায়ন নীতিমালা, ২০২৫

আগস্ট, ২০২৫

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

১.০ প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী দ্রুত নগরায়ণশীল দেশগুলোর অন্যতম। বিগত কয়েক দশকে দেশের নগরায়ণের গতি অভূতপূর্ব হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রবৃদ্ধির পেছনে শিল্পায়নের বিস্তার, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে অভিবাসনের ধারাবাহিক প্রবণতা মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৯৭৪ সালে দেশের শহরাঞ্চলে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার ছিল মাত্র ৯ শতাংশ, যা বর্তমানে ৪০ শতাংশেরও বেশি এবং অনুমান করা হচ্ছে যে ২০৪০ সালের মধ্যে এই হার ৫০ শতাংশে পৌঁছাবে। এই দ্রুত নগরায়ণ নগর অর্থনীতিকে জাতীয় জিডিপি-তে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সহায়তা করছে এবং ভবিষ্যতে এ অবদান আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে, যথাযথ পরিকল্পনা ও সমন্বয় ছাড়া এই নগরায়ণ প্রক্রিয়া দেশের শহরগুলোকে নানামুখী জটিল সংকটে ফেলেছে। অপরিকল্পিত নগর সম্প্রসারণ, জমির অপব্যবহার, পরিবেশগত অবক্ষয়, গণপরিবহনের দুর্বলতা, যানজট, জলাবদ্ধতা, সাশ্রয়ী আবাসনের অভাব এবং মৌলিক নাগরিক সেবার সংকট শহরজীবনকে কঠিন করে তুলছে। বিশেষত ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনার মতো মেগাসিটিগুলোতে এককেন্দ্রিক নগরায়ণ এবং অনিয়ন্ত্রিত অভিবাসনের ফলে পরিবেশগত, অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত ভারসাম্য আরও জটিল হয়ে উঠেছে। এছাড়া, নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা ও নগর দরিদ্রদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবার অভাব সামাজিক বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। নগরায়ণের সঙ্গে যুক্ত একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব। অতিরিক্ত গরম, ঘন ঘন বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধস এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বিশেষ করে উপকূলীয় ও নিম্নাঞ্চলভিত্তিক শহরগুলো চরম ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। একইসঙ্গে শহরাঞ্চলে তাপদাহ, জলাবদ্ধতা ও বায়ুদূষণের কারণে জনস্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে, যা নগর জীবনমানকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। দেশের বহু নগর ঐতিহাসিক স্থাপত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ হলেও, কার্যকর নীতিমালার অভাবে এবং পরিকল্পনার ঘাটতির কারণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা আজ বিলুপ্ত বা অবহেলিত। পৃথকভাবে হেরিটেজ সংরক্ষণে কোনো নির্দিষ্ট আইন বা নীতির অভাবে ঐতিহাসিক নগর পরিচয় হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি দেখা দিয়েছে, যা নগরের সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা রক্ষায় এক গুরুতর সংকট।

যদিও সরকার নগর উন্নয়নের বিভিন্ন খাতভিত্তিক নীতিমালা ও কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে, যেমন জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালা (২০১৬), সমন্বিত পরিবহন নীতিমালা (২০১৩), বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (২০০৯), বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০, জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP), এবং ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন (NDC) ইত্যাদি। এসব উদ্যোগে পরিকল্পিত নগরায়ণ, টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু সহনশীলতা বিষয়ে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা রয়েছে। তবে এসব নীতিমালা ও কৌশল খাতভিত্তিক ও খণ্ডিত হওয়ায় একটি সমন্বিত জাতীয় নগরায়ণ নীতিমালার অভাব প্রকট। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতিতে অংশীদার, যা নগর উন্নয়নকে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার লক্ষ্যে কাজ করে। এর মধ্যে রয়েছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) - Goal 11, যা নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্থিতিশীল ও পরিবেশবান্ধব নগর গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করে; সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্ক (২০১৫-২০৩০), যা দুর্যোগ সহনশীল নগর ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব দেয়; প্যারিস জলবায়ু চুক্তি (২০১৫), যা কম-কার্বন নির্গত, পরিবেশবান্ধব শহর গঠনের প্রতিশ্রুতি দেয়; কুনমিং-মন্ট্রিয়াল জৈববৈচিত্র্য কাঠামো (২০২২), যা নগর সবুজায়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বারোপ করে; এবং নিউ আরবান এজেন্ডা (Habitat III), যা একটি সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি নগর উন্নয়ন কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। এসব বৈশ্বিক অঙ্গীকারের বাস্তবায়নে দেশের প্রেক্ষাপটে উপযোগী একটি সামগ্রিক নগর নীতিমালা জরুরি হয়ে উঠেছে।

উপরে বর্ণিত অভ্যন্তরীণ নগর সংকট ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের আলোকে একটি সমন্বিত, ভবিষ্যতমুখী ও বাস্তবভিত্তিক জাতীয় নগরায়ণ নীতিমালা ২০২৫ (খসড়া) প্রণয়ন এখন সময়ের দাবি। এই নীতিমালা নগর পরিকল্পনা, ভূমি ব্যবহার, পরিবেশ সংরক্ষণ, আবাসন, অর্থায়ন কাঠামো এবং নগর প্রশাসনকে একটি সমন্বিত কাঠামোর আওতায় আনবে। এটি নগরের ঐতিহ্য সংরক্ষণ, জলবায়ু সহনশীলতা ও সবার জন্য বাসযোগ্য নগর নিশ্চিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি, এটি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নগর উন্নয়নের একটি সুসংগত ও কার্যকর রূপরেখা প্রদান করবে। সুতরাং, এখন জাতীয় নগরায়ণ নীতিমালা ২০২৫ শুধুমাত্র একটি নীতিকথা নয়, বরং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নগর ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের একটি মাইলফলক। এর সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে নাগরিকদের জন্য বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দেশের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার পথ সুগম হবে। এটি একটি আধুনিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই নগর ভবিষ্যতের ভিত্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

২.০ নীতিমালার লক্ষ্য:

জাতীয় নগরায়ন নীতিমালার মূল লক্ষ্য হলো সুষম (Balanced) নগরায়ন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, উন্নত জীবনযাত্রা ও জলবায়ু সহনশীলতার মাধ্যমে একটি টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক, সুপরিকল্পিত ও পরিবেশবান্ধব নগর কাঠামো গড়ে তোলা।

৩.০ মূল উদ্দেশ্য:

জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় পর্যায়ে অপরিকল্পিত নগর বিস্তার রোধ, সুসংগঠিত ভূমি ব্যবহার, উন্নত অবকাঠামো এবং সমন্বিত ও পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের মাধ্যমে বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করা।

৪.০নগর নীতি কাঠামো (Policy Framework):

৪.১. নগর পরিকল্পনা:

৪.১.১. একটি জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা তৈরি করা এবং এর বাস্তবায়ন ও তদারকির জন্য জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন করা। এই কাউন্সিলের অধীনে একটি পরিকল্পনা বিভাগ বা দপ্তর স্থাপন করা, যা দেশের নগর, গ্রাম ও অন্যান্য অঞ্চলের স্থানিক পরিকল্পনা, উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবে করবে। এই পরিকল্পনা বিভাগ/দপ্তরের কাজগুলো নিম্নরূপ:

(ক) দেশের জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের পরিকল্পনা তৈরি, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা।

(খ) স্থানীয় পর্যায়ে যেসব পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়, সেগুলোতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে কারিগরি সহায়তা, দিকনির্দেশনা ও প্রয়োজনীয় সমন্বয় প্রদান করা।

(গ) জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা, অবকাঠামো উন্নয়ন, ভূমি ব্যবহার এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সকল মন্ত্রণালয়, সরকারি দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানকে পরিকল্পনাগত কারিগরি সহায়তা, নির্দেশনা ও সমন্বয় প্রদান করা।

(ঘ) পরিকল্পনা বিভাগের প্রধান পরিকল্পনাবিদ হিসেবে জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কাউন্সিলের সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করা।

৪.১.২. তিনটি স্তরে - জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় - স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং প্রতিটি পরিকল্পনা বিধি অনুসারে সরকারের অনুমোদনক্রমে গেজেট আকারে প্রকাশ করার মাধ্যমে আইনগত বৈধতা প্রদান করা।

৪.১.৩. যে কোনো উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের আগে গেজেটকৃত স্থানিক পরিকল্পনার সঙ্গে প্রকল্পটির সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করা। তবে বিশেষ চাহিদা বা ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির ক্ষেত্রে প্রকল্প প্রস্তাবনার প্রয়োজন অনুযায়ী স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় পর্যায়ে গণশুনানি আয়োজন করা এবং পরিকল্পনা বিভাগ/দপ্তরের অনুমোদন গ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।

৪.১.৪. প্রতিটি শহরের অবস্থান, জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং প্রশাসনিক গুরুত্ব অনুযায়ী শহরগুলোকে শ্রেণিবিন্যাস (Urban Hierarchy) (পরিশিষ্ট-ক) করা এবং এ শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তিতে প্রতিটি স্তরের শহরের জন্য বাস্তবভিত্তিক, সমন্বিত এবং অঞ্চলভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী সুসংহত ও মানসম্পন্ন কৌশলগত ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

৪.১.৫. শহরের অনিয়ন্ত্রিত/অপরিকল্পিত সম্প্রসারণ রোধ, জনসংখ্যার চাপ মোকাবিলা এবং পরিকল্পিত নগরায়ণ নিশ্চিত করার জন্য দীর্ঘমেয়াদি স্থানিক পরিকল্পনা (Spatial Plan) প্রণয়ন করা এবং এর মাধ্যমে শহরের ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যার ঘনত্ব, পরিবেশগত সংবেদনশীলতা, অবকাঠামোর সক্ষমতা ও নাগরিক সেবার প্রাপ্যতা বিবেচনায় নিয়ে নগর বৃদ্ধির একটি নির্দিষ্ট সীমা (Urban Growth Limit) নির্ধারণ করা।

৪.১.৬. প্রতিটি শহরের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ও সমন্বিত স্থানিক পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বিশেষ গুরত্ব প্রদান করতে হবে:

(ক) জোনিং বিধি ও ভূমি ব্যবহারের নিয়মাবলী নির্ধারণ,

(খ) শহরের বিস্তার ও অবকাঠামো উন্নয়নকে পরিকল্পিতভাবে পরিচালনা,

(গ) পরিবেশ রক্ষা ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ নিশ্চিত করা,

(ঘ) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও অন্যান্য সামাজিক সেবার ভারসাম্যপূর্ণ বণ্টনে সহায়তা করা।

(ঙ) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা ও দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি। অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধার কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো যেমন পানির উৎস, জরুরি সড়ক, ফায়ার লেন ও ওপেন স্পেস অন্তর্ভুক্ত করা

(চ) পরিবহন ও চলাচল ব্যবস্থার সমন্বিত পরিকল্পনা (Integrated Mobility Planning) করা, অর্থাৎ সার্বজনীন, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব গণপরিবহন ব্যবস্থা এবং নন-মোটরাইজড পরিবহনের (যেমন: সাইকেল, হাঁটা) সুযোগ নিশ্চিত করা।

(ছ) আর্থ-সামাজিক বৈষম্য হ্রাস ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নগরায়ণের মাধ্যমে নগররের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের জন্য আবাসন, কর্মসংস্থান ও সেবা প্রাপ্তির সমতা নিশ্চিত করা।

(জ) ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে স্থানীয় ইতিহাস, স্থাপত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় বিশেষ দৃষ্টি প্রদান।

(ঝ) উন্মুক্ত ও সবুজ স্থান সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ

(ঞ) ভবিষ্যতের নীতিনির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রতিটি নগরীর জন্য মৌলিক উপাত্ত সম্বলিত একটি কার্যকর তথ্য ভান্ডার (Urban Information System) গড়ে তোলা।

(ট) পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনসংলাপ, ওয়ার্কশপ, শুনানি সভা আয়োজন করে জনগণের মতামত গ্রহণ এবং তা বিবেচনায় নেয়া।

৪.১.৭. প্রতিটি পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, নগর ও মহানগরের জন্য দীর্ঘমেয়াদি স্থানিক পরিকল্পনা (Spatial Plan) প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করা। পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহ এবং অন্যান্য পরিকল্পনা প্রণয়নকারী সংস্থা কর্তৃক কারিগরি সহায়তা গ্রহন করা।

৪.১.৮. স্থানিক পরিকল্পনা (Spatial Plan) চূড়ান্তকরণের পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের (গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ/ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়) অনুমোদনের মাধ্যমে পরিকল্পনাসমূহকে আইনি কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা এবং স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প গ্রহণ, জমি ব্যবহার, অবকাঠামো নির্মাণ ও সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে অনুমোদিত পরিকল্পনা বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করা।

৪.১.৯. পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুবিধার্থে প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় " পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ইউনিট" গঠন করা। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ইউনিটটি মেয়র বা পৌরসভা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে পরিকল্পনাবিদ, প্রকৌশলী ও নগর ব্যবস্থাপক এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন সংস্থা ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠন করা।

৪.১.১০. পরিকল্পনাভিত্তিক উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, বিল্ডিং কোড, জোনিং আইন হালনাগাদ করে স্থানিক পরিকল্পনার প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং প্ল্যানের পরিপন্থী কোন প্রকল্প, নির্মাণ বা উন্নয়ন কার্যক্রম স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না দেয়া। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪.১.১১. প্রতি ৫ বছরে একবার মাস্টারপ্ল্যান পুনঃমূল্যায়ন ও প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধনের ব্যবস্থা করা।

৪.১.১২. মেগাসিটিগুলোতে জনসংখ্যার ঘনত্ব, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো, আধুনিক নগর প্রযুক্তি, আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থার পাশাপাশি উঁচু ঘনত্বের মিশ্র-ব্যবহার জোন গড়ে তোলার জন্য বিশেষ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

৪.১.১৩. মেগাসিটিগুলোর ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি শহরগুলোর উন্নয়ন এবং সুষ্ঠু আন্তঃসংযোগ স্থাপনের জন্য পরিকল্পিত বিনিয়োগ ও অবকাঠামো সম্প্রসারণ করা এবং এককেন্দ্রিক নগরায়নের পরিবর্তে বহুকেন্দ্রিক নগরায়ন (Polycentric Urbanization) নিশ্চিত করা। যেমন: নতুন উপশহর (Satellite Town) গড়ে তোলা এবং প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কর্মকান্ড বিকেন্দ্রীকরণ করা।

৪.১.১৪. জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে যেসব এলাকা দ্রুত বাড়ছে বা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে (Growth Conurbations), সেসব অঞ্চল চিহ্নিত করে সেখানে আঞ্চলিক পরিকল্পনা তৈরি করা এবং এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ কেন্দ্র, বিভাগ এবং স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয় ও নজরদারির মাধ্যমে পরিচালনা করা।

৪.১.১৫. সুষম (Balanced) নগরায়নের জন্য জেলা ও উপজেলা শহরগুলোতে অবকাঠামো উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং শহর ও গ্রামীণ এলাকার মধ্যে সুষম উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করা।

৪.১.১৬. স্থানীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সামাজিক সংহতি বজায় রাখা এবং বসবাসযোগ্যতা উন্নত করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে নগর উন্নয়ন ও ভূমি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্পৃক্ত করা।

৪.১.১৭. কৃষি জমি সংরক্ষণের জন্য শহর এলাকায় কমপ্যাক্ট ডেভেলপমেন্টকে উৎসাহিত করা এবং নির্ধারিত জনঘনত্ব অর্জনের পূর্বে নতুন শহরাঞ্চলে অনিয়ন্ত্রিত অভিবাসন নিরুৎসাহিত করা। জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনায় জনঘনত্বের মানদন্ড নির্ধারণ করে টেকসই নগরায়ন নিশ্চিত করা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিকল্পিত নগর সম্প্রসারণ বাস্তবায়ন করা।

৪.১.১৮. একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নগরায়ণ নিশ্চিত করার জন্য নগর অঞ্চলের অন্তর্গত গ্রাম উন্নয়নকে নগর উন্নয়নের সঙ্গে সমন্বিতভাবে পরিচালনা করা।

(ক) অপরিকল্পিত, সংকীর্ণ ও বিচ্ছিন্নভাবে গঠিত গ্রামীণ অঞ্চলসমূহকে আধুনিক উন্নয়ন প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পুনর্গঠন (Redevelopment) করা এবং নগরের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভূমি পুনর্বিন্যাস (land readjustment) পদ্ধতি একটি কার্যকর কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা।

(খ) গ্রামীণ এলাকার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের পাশাপাশি অবকাঠামো, ইউটিলিটি সুবিধা এবং জনসেবার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা।

(গ) স্থানীয় জনগণের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সক্রিয় রাখতে গ্রামীণ এলাকায় স্বল্পমূল্যের বাণিজ্যিক ভবন ও বাণিজ্যিক স্থাপনাগুলোর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা।

(ঘ) বসবাসযোগ্যতা, সেবা প্রদান এবং অর্থনৈতিক সুযোগের সমন্বয় ঘটাতে পরিকল্পিতভাবে নতুন গ্রাম উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

৪.২. নগর অর্থনীতি:

৪.২.১. নগর অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে টেকসই নগর অবকাঠামো বিনিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণ করা। নগর পরিকল্পনায় বহুমুখী অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সুযোগ সৃষ্টি করে ব্যবসা ও বিনিয়োগ পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তা গড়ে তোলা এবং বিদ্যমান উদ্যোক্তাদের জন্য সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা। শিল্প এলাকা ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলোর মধ্যে সমন্বয় বাড়িয়ে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

৪.২.২. প্রতিটি শহরের ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যমান বিসিক শিল্পনগরীগুলোকে আধুনিক প্রযুক্তি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে সংস্কার ও পুনর্গঠনের পাশাপাশি বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা। একই সঙ্গে বিভিন্ন শিল্প খাত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা।

৪.২.৩. স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে শহরভিত্তিক কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ব্যবসা, কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নয়ন, স্থানীয় উৎপাদনের সক্ষমতা বাড়ানো এবং বাজার সংযোগ জোরদার করা; ঐতিহ্যবাহী ও পরিবেশবান্ধব শিল্প খাতের বিকাশের মাধ্যমে নগর অর্থনীতিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই করা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (SMEs) এর জন্য প্রণোদনা, সহজ ঋণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করা হবে।

৪.২.৪. সব শ্রেণির মানুষের জন্য সমান অর্থনৈতিক সুযোগ নিশ্চিত করতে উন্নত বাজারব্যবস্থা, উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান তৈরি করা।

৪.২.৫. বস্তি ও অনানুষ্ঠানিক বসতির বাসিন্দাদের জন্য কাজের সুযোগ, ক্ষুদ্রঋণ, জীবনমান উন্নয়ন এবং মৌলিক সেবার সংযোগ নিশ্চিত করা।

৪.২.৬. আধুনিক ও কার্যকর নগর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য সামগ্রিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনায় তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা (Data Driven Planning) ও সুশাসন চালু করা।

৪.২.৭. শ্রমশক্তিকে নগর পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করা এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় ধরনের শ্রমশক্তির জন্য ন্যায্য মজুরি, আবাসন, পরিবহন ও অন্যান্য অবকাঠামোগত সুবিধাসহ সমন্বিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত করা।

৪.২.৮. নগর অর্থনীতিতে অনানুষ্ঠানিক খাতকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাদের পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা। উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডে অনানুষ্ঠানিক খাতের অবদান গুরুত্ব বিবেচনায় তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (PPP) মাধ্যমে এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৪.৩. আবাসন ও বাসযোগ্য নগর:

৪.৩.১. জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালা ২০১৬ অনুসারে জনসংখ্যার প্রয়োজন অনুসারে সকল আয় স্তরের জনগণের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ, সুপরিকল্পিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক আবাসন নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে –

(ক) ভূমির অনুৎপাদনশীল ব্যবহার রোধে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের আবাসন উন্নয়ন প্রকল্পে প্লট-ভিত্তিক উন্নয়ন (Plot-Based Development) নিরুৎসাহিত করা। নগরীর অপরিকল্পিত সম্প্রসারণ রোধ ও কমপ্যাক্ট উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে এবং আবাসন সংকট মোকাবিলা করতে উন্নয়নকৃত আবাসিক এলাকায় ন্যূনতম ৫০% প্লট ফাঁকা থাকলে, প্লট উন্নয়নকারী সংস্থার ওপর অতিরিক্ত কর (Additional Tax) আরোপ করা।

(খ) নিম্ন ও মধ্যম আয়ের জনগণের জন্য ভর্তুকিযুক্ত আবাসন প্রকল্প, ভাড়াভিত্তিক আবাসন, স্বল্প ব্যয়ের গৃহনির্মাণ সুবিধা এবং সমবায়ী আবাসন (Cooperative Housing) ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ভূমিহীন ও গৃহহীন জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক আবাসন প্রকল্প (Social Housing) বাস্তবায়ন করা হবে। গৃহঋণ সহজলভ্য করা, ভূমির ন্যায্য বণ্টন ও অনানুষ্ঠানিক বসতির অধিবাসীদের পুনর্বাসন নিশ্চিত করা।

(গ) সমাজের সকল স্তরের মানুষের নিরাপদ বসবাস নিশ্চিত করার জন্য নারী, প্রবীণ, শিশু, বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং এ ধরনের প্রকল্পে সামাজিক নিরাপত্তা, প্রতিবন্ধী-সুবিধাসম্পন্ন নকশা, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সেবার সংযোগ নিশ্চিত করা।

(ঘ) শহরের যানজট কমিয়ে পরিবেশবান্ধব নগরায়নকে উৎসাহিত করার জন্য Transit-Oriented Development (TOD) এর মাধ্যমে জনপরিবহন কেন্দ্রিক উন্নয়নের গতি বাড়ানো, যাতে কর্মস্থলের কাছাকাছি আবাসন নিশ্চিত হয় এবং যাতায়াতের সময় ও ব্যয় হ্রাস পায়।

৪.৩.২. পরিবেশবান্ধব ও টেকসই নগরায়ন নিশ্চিত করতে সবুজ অবকাঠামো (Green Infrastructure), নবায়নযোগ্য জ্বালানি, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জলাধার ও খোলা স্থান সংরক্ষণ, সবুজ করিডোর (Green Belt), এবং জ্বালানি-দক্ষ নির্মাণ উপকরণের ব্যবহার উৎসাহিত করা।

৪.৩.৩. শহরের ভবনগুলো নিম্ন-কার্বন, জ্বালানি-সাশ্রয়ী এবং জলবায়ু-সহনশীল করার জন্য Building Energy Efficiency Code ও Green Building Certification System প্রণয়ন ও কার্যকর করা।

৪.৩.৪. শহরের পুরাতন ও অপরিকল্পিত অংশে অবকাঠামো উন্নয়ন ও জনঘনত্ব ব্যবস্থাপনার জন্য Urban Renewal, Land Redevelopment, Land Readjustment, Land Pooling এবং Urban Regeneration কৌশল প্রয়োগ করা।

৪.৩.৫. নিম্নবিত্ত, বস্তি ও অনানুষ্ঠানিক বসতির উন্নয়নে অংশগ্রহণমূলক পুনর্বাসন, Serviced Land Development, এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) ভিত্তিতে বা বেসরকারি (যেমন এনজিও, ব্যাংক, হাউজিং কোম্পানি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান) অংশগ্রহণে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা:

(ক) সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন (Affordable Housing) প্রকল্প বাস্তবায়ন করা, যা ভূমি, অবকাঠামো ও নির্মাণ ব্যয় হ্রাসের প্রযুক্তি ও ডিজাইন প্রয়োগের মাধ্যমে গৃহীত হবে।

(খ) ন্যূনতম মানসম্পন্ন সেবাসমূহ যেমন পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একক পরিবার ভিত্তিক আবাসন, ডরমেটরী ধরণের আবাসন ও মিশ্র আবাসিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।

(গ) ভূমি মূল্যায়ন, আবাসনের অর্থায়ন কাঠামো এবং ব্যবস্থাপনার দিক থেকে দীর্ঘমেয়াদি কার্যকারিতা নিশ্চিত করে বাণিজ্যিকভাবে টেকসই মডেল প্রণয়ন করা।

(ঘ) অবৈধ দখল পুনঃস্থাপন না করে পুনর্বাসনের পূর্বে অংশগ্রহণমূলক সামাজিক মূল্যায়ন, মানবিক ও প্রাসঙ্গিক চাহিদাভিত্তিক হিউম্যান-সেন্ট্রিক ডিজাইন প্রয়োগের মাধ্যমে নিম্নবিত্ত আয়ের জনবসতি জীবনমান, সামাজিক সংহতি ও স্থানিক অধিকার নিশ্চিত করা।

৪.৩.৬. শহরের নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য ভাড়াভিত্তিক আবাসন ব্যবস্থা করা এবং এ ক্ষেত্রে নিম্ন বিষয়গুলি বিবেচনায় নেয়া:

(ক) বাজার মূল্য ও আয়ভেদে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ভাড়ার সুযোগ রাখা এবং তদানুসারে ভাড়ার শ্রেণিকরণ করা;

(খ) দেশের মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয় বিবেচনায় ভাড়া বৃদ্ধি, ভাড়াটিয়া অধিকার রক্ষা ও আবাসনের মান রক্ষার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নির্ধারণ করা,

(গ) ভাড়াভিত্তিক আবাসনের জন্য ভর্তুকি, ভাউচার বা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৪.৪. **ঐতিহাসিক ভবন ও স্থাপনার সংরক্ষণ**

৪.৪.১. জিআইএস ম্যাপিং ও ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন ব্যবহার করে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ভবন ও স্থাপনাসমূহের তালিকা ও শ্রেণিবিন্যাসের জন্য একটি জাতীয় ঐতিহ্য নিবন্ধন (National Heritage Register) প্রণয়নের মাধ্যমে একটি ঐতিহ্য সংরক্ষণ তালিকা প্রস্তুত করা।

৪.৪.২. স্থাপত্যিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের ভিত্তিতে ঐতিহাসিক ভবনসমূহকে জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে গ্রেডিং করার স্পষ্ট নির্দেশিকা প্রণয়ন করা।

৪.৪.৩. ঐতিহাসিক ভবন ও স্থাপনাসমূহের সংরক্ষণ ও অরক্ষিত স্থাপনার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রত্নতত্ত্ব আইন, ১৯৬৮ এর সংশোধন, আপডেট এবং কঠোরভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

৪.৪.৪. ঐতিহাসিক ভবনের অননুমোদিত পরিবর্তন বা ধ্বংসের বিরুদ্ধে শাস্তি নির্ধারণ এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ভবণ সংরক্ষণে উৎসাহিত করতে কর ছাড় ও ভর্তুকি প্রদান করা।

৪.৪.৫. ঐতিহাসিক এলাকা সুরক্ষা করতে শহর উন্নয়ন পরিকল্পনায় ঐতিহ্য সংরক্ষণ অঞ্চল (Heritage Protection Zones) ও বাফার জোন নির্ধারণ করা এবং ঐতিহ্য স্থানের আশেপাশে অনিয়ন্ত্রিত নগর উন্নয়ন রোধ করার জন্য ঐতিহ্যগত প্রভাব মূল্যায়ন (HIA) বাধ্যতামূলক করা।

৪.৪.৬. ঐতিহ্য ভবনের গঠনগত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ ও আধুনিক কার্যক্রমের সাথে ঐতিহ্যের সামঞ্জস্য বজায় রেখে কার্যকর পুনঃব্যবহারের (adaptive reuse) সুযোগ তৈরি করা।

৪.৪.৭. সংরক্ষণকাজে টেকসই নির্মাণ উপকরণ ও ঐতিহ্যবাহী কারিগরি কৌশল ব্যবহার করা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (DRM) প্রযুক্তির বাস্তবায়ন করা

৪.৪.৮. ঐতিহ্য সংরক্ষণ-ভিত্তিক নগর উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করে পুরনো এলাকাগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে পুনরুজ্জীবিত করা এবং ঐতিহ্য ভবন সংরক্ষণের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ বা অনুদান প্রদান করা

৪.৪.৯. জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ তহবিল (National Heritage Conservation Fund) গঠন করে সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থায়ন নিশ্চিত করা এবং সরকার-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) এর মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী টেকসই ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা। বহুজাতিক কোম্পানি, ব্যাংক এবং অনুরূপ অন্যান্য সংস্থাগুলো তাদের কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব (Corporate Social Responsibility) কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ঐতিহ্যবাহী ভবন ও স্থাপনার সংরক্ষণে উৎসাহ প্রদান করা।

৪.৪.১০. স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মধ্যে পরিকল্পিত সমন্বয় কাঠামো গড়ে তোলা। পাশাপাশি, ঐতিহ্য সংরক্ষণে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৪.৫. নগর পরিবহন ব্যবস্থা: নগরের অধিবাসী এবং আগমনকারীদের জন্য নিরাপদ, সাশ্রয়ী, টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক, সার্বজনীন প্রবেশগম্য ও পরিবেশবান্ধব যাতায়াত নিশ্চিতকরণ।

৪.৫.১. Land Use এবং Transport Plan এর মধ্যে সমন্বয় করা, সেক্ষেত্রে TDM (Transportation Demand Management) পদ্ধতি অনুসরণ করা। নগরের আকার, ধরন ও বৈশিষ্ট্য মোতাবেক লাগসই পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

(ক) নিরাপদ, সাশ্রয়ী, সহজপ্রাপ্য এবং পরিবেশবান্ধব টেকসই গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য স্থানিক পরিকল্পনায় গণপরিবহন নেটওয়ার্ক নির্ধারণ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। পাশাপাশি, পরিবহন ব্যবস্থায় যাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা (যেমন: যাত্রাবিরতির স্থান, ছাউনিযুক্ত স্টপেজ, সময়সূচি ইত্যাদি) নিশ্চিত করা।

(খ) ব্যক্তিগত গাড়ির বিকল্প হিসেবে জনগণকে গণপরিবহন ব্যবহারে উৎসাহিত করতে ট্রানজিট-ভিত্তিক নগরায়ন (Transit-Oriented Development - TOD) বাস্তবায়ন করা।

(গ) গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানোর জন্য স্বল্প কার্বন নির্গমনযুক্ত, সাশ্রয়ী ও নবায়নযোগ্য জ্বালানীচালিত গণপরিবহন ব্যবস্থা (low-emission public transport) সম্প্রসারণ করা। টেকসই পরিবহন প্রচলনে বৈদ্যুতিক গণপরিবহন ব্যবস্থার জন্য প্রণোদনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন করা এবং বৈদ্যুতিক যানবাহন ব্যবহারের প্রসারে বা চার্জিং স্টেশন স্থাপনের সম্ভাব্য স্থানিক অবস্থান স্থানিক পরিকল্পনায় চিহ্নিত করা।

(ঘ) সমন্বিত ও টেকসই গণপরিবহন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে নগরের চাহিদা ও সম্ভাব্যতা অনুসারে মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (BRT), রেল সেবা বা রাইড শেয়ারিং ব্যবস্থা চালু করা।

৪.৫.২. সমতাভিত্তিক ও সাশ্রয়ী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

(ক) সকলের উপযোগী ও সাশ্রয়ী এবং সার্বজনীন প্রবেশযোগ্য গণপরিবহন অবকাঠামো নিশ্চিত করতে ইউনিভার্সাল ডিজাইন নীতি অনুসরণ করা। বিশেষকরে প্রবীণ এবং বিশেষভাবে সক্ষমদের গণপরিবহন অবকাঠামো নিশ্চিত করতে ইউনিভার্সাল ডিজাইন নীতি অনুসরণ করা।

(খ) নারী ও শিশুদের জন্য নিরাপদ গণপরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে জেন্ডার রেসপনসিভ ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থা করা।

(গ) স্কুলগামী শিক্ষার্থীর নিরাপদে বিদ্যালয়ে চলাচলের জন্য টেকসই পরিবহন ব্যবস্থা যেমনঃ পায়ে হেঁটে, বাই সাইকেল, অযান্ত্রিক রিকসা, স্কুল বাসের (প্রয়োজনে বড় শহরে) প্রচলন করা।

৪.৫.৩. নগরের ট্রাফিক ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে আধুনিক ও সময়োপযোগী যেমন: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (AI) Intelligent Transport System (ITS) এবং রিয়েল-টাইম ট্রাফিক মনিটরিং প্রযুক্তি ব্যবহার করা। যানজট ও অব্যবস্থাপনা কমাতে মাল্টিলেভেল পার্কিং সুবিধা গড়ে তোলা, নির্দিষ্ট পার্কিং জোন নির্ধারণ করা হবে এবং একটি আধুনিক পার্কিং নীতিমালা প্রণয়ন করা।

৪.৫.৪. আন্তঃশহর ও শহরতলির মধ্যে যোগাযোগ সহজ করার জন্য সড়ক, রেল, নৌপথ ও আকাশ পথের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহন (Multimodal Transport Integration) ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং সমন্বিত ডিজিটাল টিকেটিং ব্যবস্থা চালু করা।

৪.৫.৫. পরিবেশবান্ধব ও কার্বন নির্গমন হ্রাসকরণ ব্যবস্থা: জলবায়ু সহনশীল ও টেকসই নগর পরিবহন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে –

(ক) সাইকেল লেন ও হাঁটার উপযোগী ফুটপাত সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে নগরীতে সাইকেলভিত্তিক ও পায়ে হাঁটার উপযোগী অঞ্চল (Pedestrian-friendly zones & Pedestrian Only Roads) গড়ে তোলা এবং ফুটপাত ও রাস্তা পারাপারের সুবিধাসহ সকল ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করা।

(খ) জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবিলায় দুর্যোগ সহনশীল (Disaster resilient) ও প্রাকৃতিক অবকাঠামো (Green Infrastructure, Urban Lifeline) যেমন সবুজ করিডোর ও ওয়াকওয়ে স্থাপন করা।

(গ) ভৌগলিক অবস্থান অনুযায়ী নগর ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার মধ্যে যোগাযোগের জন্য পানি-ভিত্তিক (নৌ) পরিবহন ব্যবস্থা চালু ও সম্প্রসারণ করা।

(ঘ) স্থানিক পরিকল্পনায় ব্যাটারি চালিত ও অ-যান্ত্রিক যানবাহন চলাচলের জন্য সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রণয়ণ করা এবং ব্যাটারী ব্যাংক বা চার্জ স্টেশনগুলোকে সুনির্দিষ্ট করা।

(ঙ) দূষণ মুক্ত নগর গড়তে নির্দিষ্ট অঞ্চলকে লো-এমিশন জোন (LEZ) ও কার-ফ্রি জোন হিসেবে ঘোষণা করা।

৪.৫.৬. ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে নগরে পার্কিংয়ের স্থান সীমিত করা, উচ্চ হারে পার্কিং ফি নির্ধারণ করা এবং কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করা।

৪.৫.৭. গনপরিবহন এর স্টেশন, টার্মিনাল ও হাব গুলিতে “বাইক এন্ড রাইড” সিস্টেম চালু করা।

৪.৫.৮. নগরের অভ্যন্তরে এবং আশেপাশের অঞ্চলের মধ্যে মালামাল পরিবহনে Freight Transport policy ও প্ল্যান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

৪.৬. নগর পরিসেবা:

৪.৬.১. **পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা:** নগরবাসীর জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত এবং সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে সমন্বিত ও টেকসই ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা। একই সঙ্গে, নগর এলাকায় জলাবদ্ধতা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিশ্চিত করা।

(ক) ভূগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস করতে ভূ-পৃষ্ঠের পানির ব্যবহার উৎসাহিত করা এবং অনিয়ন্ত্রিত গভীর নলকূপ স্থাপন নিয়ন্ত্রণ করা।

(খ) সুপেয় পানির সরবরাহ ব্যবস্থা সম্প্রসারণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং নগর এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত করা।

(গ) জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সক্ষমতা বাড়ানো।

(ঘ) বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, পুনঃব্যবহার এবং ভূগর্ভস্থ পানির পুনর্ভরণ (Groundwater Recharge) প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা এবং স্থানিক পরিকল্পনায় (Spatial Planning) ভূগর্ভস্থ পানির পুনর্ভরণ নিশ্চিত করতে Recharge Well নির্দিষ্ট করাএবং নিস্কাশন ব্যবস্থায় প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধান (Nature-Based Solutions) সংযোজন করা।

(ঙ) নগর এলাকায় জলাবদ্ধতা ও বন্যার ঝুঁকি হ্রাসের জন্য আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং প্রধান নগরগুলোর বিদ্যমান ড্রেনেজ ব্যবস্থা সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা।

(চ) অপরিকল্পিত নগরায়ণের কারণে পানি নিষ্কাশনের প্রতিবন্ধকতা জলাবদ্ধতা রোধে নদী, নালা, খাল, বিল, হাওড়, বাওড়, পুকুর ও অন্যান্য প্রাকৃতিক জলধার সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করা। পাশাপাশি, পানি দ্রুত মাটিতে শোষিত হয়ে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পুনরুদ্ধার ও অতিবৃষ্টির কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা হ্রাসে করার জন্য পাবলিক স্পেস, পার্ক ও ফুটপাতের মতো খোলা জায়গায় পারমিয়েবল ব্লক (Permeable Blocks) ব্যবহার করা।

(ছ) পানি সংকট মোকাবিলায় শোধিত বর্জ্য পানি কৃষি, শিল্প, ও নগর সেবায় ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করা।

(জ) নগর এলাকায় জলাবদ্ধতা ও বন্যার ঝুঁকি কমাতে টেকসই নিষ্কাশন ব্যবস্থা (Sustainable Drainage Systems) উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

(ঝ) নগর এলাকায় জলাবদ্ধতা প্রতিরোধে সুপরিকল্পিত, আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব জলনিস্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা, যাতে অতিবৃষ্টির পানি দ্রুত নিষ্কাশিত হয়ে প্রাকৃতিক জলপ্রবাহের স্বাভাবিক গতি বজায় থাকে, পরিবেশগত ভারসাম্য নিশ্চিত হয় এবং নগর জীবনযাত্রার স্থিতিশীলতা ও বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

৪.৬.২. **আধুনিক, টেকসই ও স্বাস্থ্যসম্মত নগর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা:**

পরিকল্পিত নগর উন্নয়নের অংশ হিসেবে নিরাপদ ও টেকসই পয়ঃনিষ্কাশন অবকাঠামো গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে -

(ক) সকল এলাকায় আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকায় সুষ্ঠু পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং বর্জ্য পানি পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ ও পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

(খ) জনস্বাস্থ্য এবং জীবনমানের উন্নয়নে নগর অবকাঠামো, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করে পুরনো শহরের বসবাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করা।

(গ) কঠিন ও তরল বর্জ্যের পৃথক সংগ্রহ, পুনঃব্যবহার ও পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা উন্নত করা এবং নগর এলাকায় বর্জ্য পৃথকীকরণের জন্য কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পিত ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

(ঘ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিশেষ করে বাজার এলাকা, পাবলিক স্পেসে গণ সৌচাগার (Public Toilet) এর জন্য নির্ধারিত স্থান চিহ্নিত করা এবং সুপরিকল্পিতভাবে তা বাস্তবায়ন করা।

৪.৬.৩. **টেকসই নগর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা:**

(ক) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পুনঃব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং কৃষি ও নগর সবুজায়নে জৈব সার ব্যবহারে উৎসাহিত করা।

(খ) আধুনিক বর্জ্য সংগ্রহ, স্বয়ংক্রিয় বর্জ্য বিন্যাস ও প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকর ও পরিবেশবান্ধব করা। বর্জ্যের পরিমান কমিয়ে আনতে উৎস-ভিত্তিক পৃথকীকরণ, নিরাপদ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পুনঃব্যবহারযোগ্য উপকরণের ব্যবহারকে উৎসাহিত করা।

(গ) বর্জ্য থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ (PPP) গড়ে তোলা।

(ঘ) স্বাস্থ্যঝুঁকি হ্রাস করতে শিল্প-কারখানা, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রসহ অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্যের জন্য নিজস্ব বিশেষায়িত বর্জ্য শোধনাগার স্থাপন এবং কঠোর পরিবেশগত মানদণ্ড নিশ্চিত করা।

(ঙ) শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলোতে বর্জ্য হ্রাস, পুনর্ব্যবহার ও পুনঃচক্রায়নের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব উৎপাদন, দক্ষ সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে 'শূন্য-বর্জ্য' নীতির গ্রহণ, প্রচার ও কার্যকর বাস্তবায়ন উৎসাহিত করা।

(ক) পরিচ্ছন্ন নগর গঠনে জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণকে সম্পৃক্ত করা এবং স্কুল-কলেজসহ বিভিন্ন পর্যায়ে পানির অপচয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও "Reduce, Reuse, Recycle (3R)" নীতি প্রচার করা।

(খ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কার্যকর নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও কমিউনিটি উদ্যোগ গড়ে তোলা।

৪.৬.৪. **বিদ্যুৎ ও জ্বালানি:** নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার ও জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে SREDA কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা ও Nationally Determined Contributions (NDC) অনুযায়ী টেকসই জ্বালানি অন্তর্ভুক্ত করে নগর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

(ক) বিদ্যুৎ সরবরাহের নিরবচ্ছিন্নতা নিশ্চিত করতে স্মার্ট গ্রিড অবকাঠামো, বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং Distributed Renewable Energy System এর প্রসার ঘটানো।

(খ) ভবন, শিল্প ও অবকাঠামোতে শক্তি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ও Net Zero Energy ধারণা বাস্তবায়নের জন্য গবেষণা, উদ্ভাবনে উৎসাহিত করা এবং শক্তি সাশ্রয়ী ভবন ডিজাইনকে প্রমোট করা।

(গ) নগর বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনায় জ্বালানি দক্ষতা বাড়াতে Advanced Metering Infrastructure (AMI), Demand Side Management (DSM) ও আধুনিক Energy Management System চালু করা।

(ঘ) গ্রীন বিল্ডিং কনসেপ্ট বাস্তবায়নে টেকসই জ্বালানি প্রযুক্তির ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা, নবায়নযোগ্য শক্তি সংযোজনের জন্য Net Metering Policy কার্যকর করা এবং সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা।

(ঙ) জাতীয় গ্রিডের ওপর নির্ভরতা হ্রাস ও শহুরে নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে ভবনের ছাদ, খোলা স্থান ও অবকাঠামোয় সৌর প্যানেল স্থাপন ও এর কার্যকারিতা নিশ্চিত করা। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে Waste-to-Energy Technology ব্যবহারে উৎসাহিত করা।

৪.৬.৫. **নগর অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা:**

(ক) প্রতিটি নগরে জনসংখ্যার ঘনত্ব, ভবন উচ্চতা ও কার্যক্রমের ধরন অনুযায়ী পর্যাপ্ত সংখ্যক ফায়ার স্টেশন স্থাপন করা, যেন ৫-৭ মিনিটের মধ্যে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছানো সম্ভব হয়।

(খ) অগ্নিকান্ড স্থলে নির্বিঘ্নে পৌঁছানোর জন্য প্রশস্ত ও প্রতিবন্ধকতামুক্ত সড়ক, নির্ধারিত ফায়ার লেন ও আলাদা রেসকিউ এক্সেস নিশ্চিত করা এবং এসব লেন দখলমুক্ত রাখতে কঠোর নজরদারি করা।

(গ) বহুতল, শিল্প ও বাণিজ্যিক ভবনে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা (যেমন: ফায়ার অ্যালার্ম, স্প্রিংকলার সিস্টেম, ফায়ার এক্সটিংগুইশার, হাইড্রেন্ট সিস্টেম, ও স্মোক ডিটেকশন সিস্টেম।) স্থাপন বাধ্যতামূলক করা এবং তা নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকির আওতায় আনা।

(ঘ) অগ্নিকান্ড মোকাবেলায় পানি সংগ্রহের উৎস হিসেবে নগরের খাল, পুকুর, জলাধার, রোড সাইড হাইড্রেন্ট সিস্টেম প্রভৃতি উপযুক্ত করে সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং ফায়ার সার্ভিসের পানির উৎস হিসেবে সেগুলোর অবস্থান ও সক্ষমতা ম্যাপে অন্তর্ভুক্ত করা।

(ঙ) অগ্নিকান্ডের ঝুঁকি বিশিষ্ট অঞ্চল চিহ্নিত করে সেখানে অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা (যেমন: আগুন শনাক্তকরণ সেন্সর, সাইরেন, পানির ট্যাঙ্ক, হাইড্রেন্ট সিস্টেম) স্থাপন এবং ঝুঁকি কমাতে বিশেষ নগর নকশা ও জোনিং নির্দেশনা অনুসরণ করা।

(চ) জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক নিয়মিত অগ্নি নির্বাপণ মহড়া, প্রশিক্ষণ, স্কুল-কলেজভিত্তিক কার্যক্রম এবং জনগণের অংশগ্রহণমূলক সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।

৪.৬.৬. নগর স্বাস্থ্য পরিসেবা:

(ক) জনঘনত্ব ও যাতায়াত সুবিধাদি অনুসারে স্থানিক পরিকল্পনার জন্য প্রযোজ্য স্টান্ডার্ড নির্ধারণ করে প্রতিটি নগর ও গ্রাম অঞ্চলে আধুনিক হাসপাতাল, ক্লিনিক ও কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্থান চিহ্নিত করা।

(খ) সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে গবেষণা, টেলিমেডিসিন সেবা এবং জরুরি প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা (Emergency Response System) গড়ে তোলা।

(গ) নগর এলাকার বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ ও পানি দূষণের প্রভাব মোকাবিলায় স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(ঘ) নগর অঞ্চলে স্মার্ট হাসপাতাল ব্যবস্থা ও ডিজিটাল স্বাস্থ্য রেকর্ড চালু করা এবং স্বাস্থ্যসেবায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), ব্লকচেইন প্রযুক্তি ও ক্লাউড-ভিত্তিক তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(ঙ) সংক্রামক ব্যাধি ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধিতে কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৪.৬.৭. নগর শিক্ষা পরিসেবা:

(ক) জনঘনত্ব ও যাতায়াত সুবিধাদি অনুসারে স্থানিক পরিকল্পনার জন্য প্রযোজ্য মানদন্ড নির্ধারণ করে প্রতিটিনগর ও গ্রাম অঞ্চলে সরকারি, বেসরকারি বা উভয়ের অংশীদারিত্বের (PPP) মাধ্যমে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কারীগরি ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ করা।

(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর, শারিরিক ও প্রতিবন্ধীবান্ধব ও আধুনিক শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত পূর্বক নগর ও গ্রাম এলাকায় সকল শ্রেণির জনগণের জন্য সমান শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

(গ) ডিজিটাল শিক্ষা প্রসারে ই-লার্নিং ও অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

(ঘ) শিক্ষা সেবায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), ব্লকচেইন প্রযুক্তি ও ক্লাউড-ভিত্তিক তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।

(ঙ) শ্রমজীবী, ভাসমান জনগোষ্ঠী, ও বস্তিবাসীদের জন্য স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে শিক্ষা সেবা প্রদান নিশ্চিত করা এবং নগর দরিদ্র, শ্রমজীবী ও প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় ও ভোকেশনাল শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা।

(চ) বিদ্যালয়গামী শিশুদের নিরাপদে সড়ক পারাপার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসংলগ্ন এলাকায় শব্দদূষণ রোধ ও যানবাহনের নির্দিষ্ট গতিসীমা নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪.৬.৮. **নগর পরিচালন ব্যবস্থা:**

(ক) নাগরিক সেবাসমূহ (হোল্ডিং ট্যাক্স, ট্রেড লাইসেন্স, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, সম্পত্তি হস্তান্তর, ভবন অনুমোদন, যানবাহন পার্কিং পারমিট, ব্যবসায়িক অনুমোদন, এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম) ডিজিটালাইজ করা এবং ওয়ান-স্টপ ডিজিটাল সার্ভিস প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে নগরবাসীকে দ্রুত এবং সহজ সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

(খ) অনলাইনে কর ও ফি পরিশোধ করতে নগরবাসীর জন্য ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা চালু করা।

(গ) নাগরিকদের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও সমাধানের জন্য আধুনিক ই-গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা চালু করা, যেখানে মোবাইল অ্যাপ, ওয়েব পোর্টাল ও কল সেন্টার ব্যবহার করে নাগরিকরা তাদের সমস্যার সমাধান পাবেন।

(ঘ) নগর পরিকল্পনা ও পরিষেবা সম্পর্কে তথ্য পেতে নগরবাসীর জন্য স্বচ্ছতা উন্মুক্ত তথ্যভাণ্ডার (Open Data Initiative) চালু করা এবং নগর প্রশাসনের কাজে ব্লকচেইন প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করে তথ্যের নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

(ঙ) আধুনিক নগর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সিস্টেম চালু করা, যার মধ্যে থাকবে আধুনিক ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, নগর নিরাপত্তার জন্য কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক আধুনিক নজরদারি ব্যবস্থা (AI-based Policing), আধুনিক বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট, আধুনিক স্ট্রিট লাইটিং (Solar-powered), ডিজিটাল পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা (Air Quality & Noise Monitoring Sensors), জলাবদ্ধতা ও বন্যা ব্যবস্থাপনার জন্য স্মার্ট ড্রেনেজ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা (IoT-based Flood Control System) চালু করা।

(চ) নগর প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কর্মকর্তাদের ডিজিটাল প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন করে সমন্বিত নগর ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

৪.৭. জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব টেকসই নগরায়ন:

৪.৭.১. ভুমি ব্যবহার ও স্থানিক পরিকল্পনা:

(ক) প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং পরিবেশগত স্থিতিশীলতা (resilience) ও সহনশীলতা সমৃদ্ধ করতে জলাভূমি, নদী ও বনভূমির দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে সুসংগঠিত জোনিং নীতিমালা কার্যকর প্রয়োগ করা।

(খ) নিয়ন্ত্রিত নগর সম্প্রসারণ নিশ্চিত করতে পরিবেশবান্ধব, Compact ও মিশ্র ব্যবহার ভিত্তিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করা, যাতে জমির কার্যকর ব্যবহার বৃদ্ধি পায় এবং নগর পরিকল্পনার ভারসাম্য বজায় থাকে।

(গ) সমস্ত নগর এলাকার জন্য একটি সুসংগঠিত ও জলবায়ু-সংবেদনশীল স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এবং এ পরিকল্পনা মাধ্যমে বন্যা ঝুঁকি, তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত চাপ, জলবায়ু অভিবাসীদের পুনর্বাসন এবং অন্যান্য পরিবেশগত বিপর্যয়কে সমন্বিতভাবে বিবেচনায় নিয়ে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব নগর উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

(ঘ) জলবায়ু অভিবাসীদের জন্য শহরতলিতে বা পরিকল্পিত গ্রামীণ এলাকায় আবাসন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা। একই সাথে জলবায়ু-সংবেদনশীল এলাকার সংরক্ষণ বজায় রেখে পুনর্বাসন এলাকা নির্ধারণ করা এবং প্লাবনপ্রবণ বা দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় টেকসই আবাসন নির্মাণ ও উঁচু ভূমিতে পুনর্বাসন নিশ্চিত করা।

(ঙ) সবুজায়ন ও জলাশয় সুরক্ষা ও পুনরুদ্ধারের জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ের স্থানিক পরিকল্পনায় সরকার কর্তৃক বৈশ্বিক জীববৈচিত্র্য কাঠামো (Global Biodiversity Framework) এর জীববৈচিত্র ও পরিবেশগত মানদন্ড (জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ন্যূনতম সবুজ এলাকা শতকরা ১৫ ভাগ এবং জলাশয় শতকরা ১১-১২ ভাগ এবং উভয়ের সমন্বয়ে সর্বমোট শতকরা ৩০ ভাগ) অনুসারে এলাকা সংরক্ষণ করা।

৪.৭.২. সবুজ অবকাঠামো ও প্রকৃতি নির্ভর সমাধান (Nature-Based Solutions):

(ক) বায়ুদূষণ হ্রাস, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও নগর পরিবেশের টেকসইতা ও বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করতে পার্ক, সবুজ করিডোর ও ছাদবাগানসহ নগর সবুজায়ন সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করা।

(খ) নগর অঞ্চলে বায়ুর গুণগত মান উন্নয়ন এবং বাস্তুতন্ত্রের (Biodiversity) ভারসাম্য রক্ষায় নগর বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং বন সংরক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ নিশ্চিত করা।

(গ) স্থানীয় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সবুজায়ন বৃদ্ধি এবং পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় নগর কৃষি ও কমিউনিটি গার্ডেন স্থাপন ও সম্প্রসারণকে উৎসাহিত করা।

(ঘ) পরিবেশবান্ধব নির্মাণ প্রযুক্তির প্রসার ত্বরান্বিত করার জন্য গ্রীন বিল্ডিং নির্মাণের জন্য ট্যাক্স রিবেট, সহজ শর্তে ঋণ প্রদান সহ সামাজিক সম্মাননা প্রদান করা।

(ঙ) নগরায়নের প্রতিটি কাজে পরিবেশ সুরক্ষা অগ্রাধিকার বিবেচনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটিতে শিশু, তরুন ও যুবসমাজকে অর্ন্তভুক্ত করে বৃক্ষ রোপন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন জলবায়ু সহনশীল কার্যক্রম গ্রহন করা।

(চ) ভূমিক্ষয় (Soil Erosion) ও নদীভাঙন রোধে প্রাকৃতিক ও পরিবেশবান্ধব পদ্ধতির মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে টেকসই বনায়ন কার্যক্রম (যেমন- ভেটিভার ঘাস বা অনুরূপ গভীর শিকড়বিশিষ্ট উদ্ভিদ রোপণ) উৎসাহিত ও সম্প্রসারিত করা।

৪.৭.৩. জলবায়ু ও দুর্যাগ সহনশীল টেকসই নগর অবকাঠামো:

(ক) কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং নগর অবকাঠামোর পরিবেশগত স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই নগর উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সবুজ অবকাঠামো (Green Infrastructure) প্রযুক্তির প্রসার এবং নবায়নযোগ্য ও জ্বালানি-সাশ্রয়ী নির্মাণ উপকরণের ব্যবহার উৎসাহিত করা।

(খ) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে টেকসই ও অভিযোজনযোগ্য (Adaptation) সড়ক, সেতু এবং ইউটিলিটি অবকাঠামোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা।

৪.৭.৪. জলবায়ু অভিযোজন (Adaptation) ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস:

(ক) প্রারম্ভিক সতর্কীকরণ ব্যবস্থার (early warning systems) আধুনিকায়ন এবং দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা উন্নত করা এবং দুর্যোগ পূর্বাভাস ও মোকাবিলা দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জলবায়ু-ঝুঁকি সহনশীলতা বৃদ্ধি করা।

(খ) উন্নত জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা, শক্তিশালী বাঁধ ও পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর, দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই করা।

(গ) স্থানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নগরীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, তাপদ্বীপ প্রভাব (Heat Island Effect) হ্রাস এবং বাসযোগ্যতা বৃদ্ধিতে সবুজ করিডোর ও জনসাধারণের জন্য ছায়াযুক্ত স্থান নির্মাণের মাধ্যমে তাপ-সহনশীল নগর নকশা প্রণয়ন করা।

(ঘ) জলবায়ু অভিবাসীদের জন্য নিরাপদ আবাসন নকশার মাধ্যমে বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিধস প্রতিরোধী বাসস্থান নিশ্চিত করা এবং পুনর্বাসন এলাকায় জলাভূমি, বনভূমি ও কৃষিজমির টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

(ঙ) জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করতে বহুমূখী দুর্যোগ সহনশীল (Multi Hazard Risk Sensitive) স্থানিক মহাপরিকল্পনা ও সংকটকালীন বিকল্প পরিকল্পনা (Contingency Plan) প্রণয়ন করা।

৪.৭.৫. **পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Water Resource Management):**

(ক) প্রাকৃতিক পানি প্রবাহ বজায়, জলাবদ্ধতা রোধ এবং নগর পরিবেশের বাস্তুতন্ত্র (Biodiversity) টেকসই ও প্রাণবৈচিত্র্যসমৃদ্ধ রাখতে নদী, খাল ও হ্রদসহ নগরীর জলাশয়গুলো সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করা এবং নদীর আশপাশে সবুজ বাফার জোন তৈরি ও তীর সংরক্ষণ নীতি বাস্তবায়ন করা।

(খ) ভূগর্ভস্থ পানিস্তরের পুনরুদ্ধার, পানিসংকট নিরসন এবং পরিবেশবান্ধব পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে নগরীর বড় বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবনসমূহে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা (Rainwater Harvesting) ও পুন:ব্যবহারযোগ্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা।

(গ) নদী, খাল, হ্রদসহ সকল জলাধারের স্বাভাবিক প্রবাহ বজায় রাখতে, জলজ পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করতে জলাশয়ের অবৈধ দখল ও বর্জ্য ফেলে পানি দূষণ প্রতিরোধে ভূমি জোনিং নীতিমালার প্রয়োগ করা এবং মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০, পানি আইন ও পরিবেশ সংরক্ষন আইন, ২০১০ এর মধ্যে সমন্বয় সাধন ও আইনের কঠোর প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় বিধিমালা, প্রস্তুত ও এর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

(ঘ) পানি দূষণ পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়মিত মনিটরিং, জরিপ ও গবেষণার মাধ্যমে দূষণ নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম জোরদার করা।

৪.৭.৬. **বায়ুর গুণগত মান উন্নয়ন ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ:**

(ক) ইটভাটা ও শিল্প কারখানা থেকে নির্গত দূষণকারী উপাদান কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বায়ুদূষণ হ্রাস, পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা এবং জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও কঠোরভাবে পরিবেশ আইন, ২০১০ ও ইট পোড়ানো আইন প্রয়োগ করা।

(খ) যানবাহন থেকে নির্গত দূষণকারী গ্যাসের পরিমাণ কমাতে কঠোর নির্গমন মান প্রয়োগ, উচ্চমানের জ্বালানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

(গ) নির্মাণ খাতে ধুলা নিয়ন্ত্রণের জন্য পানি ছিটানো, নেট-কভার ব্যবহার এবং কম ধুলাযুক্ত নির্মাণ উপকরণ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা।

(ঘ) শিল্প কারখানায় উন্নত মানের বায়ু পরিশোধন যন্ত্র (Scrubber, Electrostatic Precipitator) স্থাপন ও কার্যকর তদারকি নিশ্চিত করা।

(ঙ) ইটভাটা ও অন্যান্য দূষণকারী শিল্পকে দূষণ কমানোর প্রযুক্তি ব্যবহারে বাধ্য করা এবং ধাপে ধাপে পরিবেশবান্ধব ইটভাটায় রূপান্তর করা।

(চ) আবাসিক ও শিল্প এলাকায় বর্জ্য পোড়ানো নিষিদ্ধ করা এবং কঠোর তদারকি নিশ্চিত করা এবং খোলা জায়গায় বর্জ্য ফেলা ও প্লাস্টিক পোড়ানো বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(ছ) নগরীর বায়ু দূষণ হ্রাসে প্রধান সড়ক, বাণিজ্যিক এলাকা ও আবাসিক অঞ্চলে ব্যাপক সবুজায়ন ও বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং নগর পরিকল্পনায় "Green Buffer Zone" সৃষ্টি করে শিল্প, পরিবহন ও আবাসিক এলাকার মধ্যে সবুজ বেষ্টনী তৈরি করা। এছাড়া ছাদ বাগান ও খোলা জায়গায় গাছ লাগানোর জন্য নীতিগত ও আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা।

৪.৭.৭. **শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ:**

(ক) আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকার জন্য ভিন্নমাত্রার শব্দ সহনশীলতার মান নির্ধারণ করা, নির্দিষ্ট সময়সীমার বাইরে উচ্চশব্দ উৎপাদন নিষিদ্ধ করা এবং শব্দ দূষণের মাত্রা নিরীক্ষণের জন্য কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

(খ) যানবাহনের অনিয়ন্ত্রিত হর্ন বাজানো বন্ধ করতে 'নো হর্ন জোন' চিহ্নিত করা এবং সড়কে শব্দ কমাতে ন্যায্য গতিসীমা নির্ধারণ ও সাউন্ড ব্যারিয়ার (Sound Barrier) স্থাপন করা। পুরনো ও অত্যধিক শব্দ উৎপাদনকারী যানবাহনের পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন এবং বৈদ্যুতিক ও হাইব্রিড গাড়ির ব্যবহার উৎসাহিত করা।

(গ) পাবলিক স্পেস, হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চারপাশে সবুজায়ন ও সাউন্ড ব্যারিয়ার স্থাপন করা।

(ঘ) নির্মাণ কাজের নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ ও ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা।

(ঙ) শিল্প ও নির্মাণ এলাকায় শব্দ শোষণকারী উপকরণ ব্যবহার বা আধুনিক শব্দ-বর্জিত প্রযুক্তি ব্যবহার করা এবং উচ্চ শব্দ উৎপন্নকারী শিল্প কারখানা আবাসিক এলাকা থেকে দূরে স্থাপন।

(চ) শব্দ দূষণের মাত্রা পরিমাপ ও মনিটরিংয়ের জন্য নগর এলাকায় পর্যাপ্ত শব্দ পরিমাপক কেন্দ্র (Noise Monitoring Station) স্থাপন।

৪.৭.৮. মাটি দূষণ নিয়ন্ত্রণ:

(ক) মাটির দূষণবোধে কঠিন বর্জ্য, রাসায়নিক ও শিল্প বর্জ্যের জন্য পৃথক সংগ্রহ ও পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। ইলেকট্রনিক বর্জ্য (E-waste) ও চিকিৎসা বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদা পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং অপ্রয়োজনীয় পলিথিন ও প্লাস্টিক ব্যবহার কমিয়ে আনতে বিকল্প পরিবেশবান্ধব উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিত করা।

(খ) বর্জ্য থেকেমাটিতে ভারী ধাতু, তেল ও রাসায়নিক পদার্থ মিশতে না পারে সেজন্য সুষ্ঠু ল্যান্ডফিল ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও ইকো-ফ্রেন্ডলি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন করা। নগর কৃষির প্রসারে ক্ষতিকর রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পরিবর্তে জৈবসার ও বায়ো-কন্ট্রোল ব্যবস্থার প্রচলন করা।

(গ) নগর এলাকায় অবৈধভাবে টপ-সয়েল অপসারণ রোধ এবং সবুজ এলাকা সংরক্ষণ ও সবুজায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে মাটির স্থায়িত্ব রক্ষা করা।

(ঘ) নগর উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় মাটির গুনাগুন সংরক্ষণের জন্য পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (EIA) বাধ্যতামূলক করা এবং নির্দিষ্ট সময় পর পর নগর এলাকায় মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য গবেষণা ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(ঙ) আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে দূষিত মাটি শনাক্তকরণ ও পুনরুদ্ধারের জন্য নগর পর্যায়ে আলাদা কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং বিদ্যমান পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী মাটি দূষণের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ।

৪.৭.৯. সবুজ ও উন্মুক্ত স্থান (Public Open Spaces):

(ক) সকল নগর মহাপরিকল্পনায় পার্ক, খেলার মাঠ ও উন্মুক্ত স্থান সংযুক্ত করে বাস্তুতন্ত্রের (Biodiversity) ভারসাম্য রক্ষা, নাগরিকদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা উন্নয়ন এবং টেকসই নগরায়ণকে নিশ্চিত করা।

(খ) স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সবুজায়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণ করে পরিবেশ সংরক্ষণ, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং টেকসই নগরায়ণ নিশ্চিত করা।

৪.৭.১০. শাসনব্যবস্থা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (Governance and Institutional Framework):

(ক) প্রতিটি পৌরসভায় পরিবেশগত স্থায়িত্ব ও জলবায়ু সহনশীলতা বিষয়ক বিশেষ ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে টেকসই উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা এবং পরিবেশবান্ধব নগর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

(খ) নগর পরিকল্পনায় কার্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করতে নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

(গ) নগর ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে ভূস্থানিক তথ্য ব্যবস্থা (GIS) ভিত্তিক তথ্য-নির্ভর পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাস্তবায়ন করা।

(ঘ) পরিবেশগত স্থায়িত্ব মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট মূল কার্যসম্পাদন সূচক (Key Performance Indicators-KPIs) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা, যা বায়ুদূষণ, পানি সম্পদ সংরক্ষণ, সবুজায়ন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর অগ্রগতি নিয়মিত পরিমাপ ও বিশ্লেষণে সহায়তা করবে।

(ঙ) নগরগুলোর পরিবেশগত স্থায়িত্ব ও টেকসই উন্নয়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য বার্ষিক স্থায়িত্ব নিরীক্ষা (sustainability audit) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা এবং টেকসই ও রেজিলিয়েন্ট নগরায়নের অংশ হিসেবে রিয়েল-টাইম পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা সংযুক্ত করা।

৪.৭.১১. **টেকসই নগরায়ণের জন্য অর্থায়ন ও প্রণোদনা:** পরিবেশবান্ধব নগর উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সবুজ অর্থায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা, যা নবায়নযোগ্য জ্বালানি, টেকসই অবকাঠামো, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু সহনশীল প্রকল্পে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে এবং নগরায়ণের টেকসইতা নিশ্চিত করবে।

(ক) সবুজ ভবন ও পরিষ্কার জ্বালানি (Clean Energy) ব্যবহারে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে কর ছাড়, ভর্তুকি এবং অন্যান্য আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা।

(খ) টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) কার্যকরভাবে কাজে লাগিয়ে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ আকর্ষণ, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং পরিবেশবান্ধব নগর উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

(গ) সরকারিভাবে "ক্লাইমেট-রেসিলিয়েন্ট" পুনর্বাসন প্রকল্প হাতে নেয়া, যেখানে জলবায়ু অভিবাসীদের জন্য আবাসন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা।

(ঘ) জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমন কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি, বৈশ্বিক তহবিলের যথাযথ ব্যবহার এবং বহুপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদার করা।

৪.৮. প্রযুক্তি নির্ভর নগর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালন:

৪.৮.১. কেন্দ্রীয় সিটি মনিটরিং সেল গঠন এবং ব্লকচেইনভিত্তিক ভূমি রেকর্ড ব্যবস্থার মাধ্যমে ভূমি বিরোধ হ্রাস ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে কার্যকর নগর ফ্রেমওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৪.৮.২. নাগরিকদের অনলাইনে ভূমি ব্যবহারের তথ্য, অনুমোদন ও সরকারি নীতিমালা সম্পর্কে সহজে অবহিত করতে ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা।

৪.৮.৩. উন্নত মানচিত্র বিশ্লেষণ, Geospatial Technology, LiDAR, 3D Mapping ও AI-সমৃদ্ধ Spatial Analytics ব্যবহারের মাধ্যমে আধুনিক নগর পরিকল্পনা ও বাস্তব সময়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে Digital Twin প্রযুক্তি চালু করা।

৪.৮.৪. নগরের তাপমাত্রা পরিবর্তন, বায়ু দূষণ এবং জলবায়ুর অন্যান্য পরিবর্তন পর্যবেক্ষণে চৌকশ জলবায়ু মনিটরিং সিস্টেম (Intelligent Climate Monitoring System) স্থাপন করা।

৪.৮.৫. GIS ও রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নয়নকৃত এলাকা, খালি জমি ও অবৈধ দখল নিরীক্ষণ, বন নিধন নিয়ন্ত্রণ, বায়ু ও পানি দূষণের মাত্রা পর্যবেক্ষণ, সৌর শক্তির জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ, শহরের বর্জ্য উৎপাদন হটস্পট চিহ্নিত করে বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, ডাম্পিং সাইট ও বর্জ্য-থেকে-জৈব শক্তি (Waste-to-bio-energy) প্ল্যান্টের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করা।

৪.৮.৬. স্যাটেলাইট ইমেজিং এবং মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে অনানুষ্ঠানিক খাত (Urban Informal sector) বিশ্লেষণ, ক্রম-সম্প্রসারণশীলতা নিরীক্ষণ করার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

৪.৮.৭. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও নগর পরিকল্পনার জন্য GIS সফটওয়্যার (ArcGIS, QGIS এবং Google Earth Engine) ব্যবহারের মাধ্যমে ভূ-তথ্য বিশ্লেষণ এবং পূর্বাভাসভিত্তিক পরিকল্পনা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা।

৪.৮.৮. উচ্চ নগরায়ন এলাকায় নগর পরিকল্পনা, অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিবহন, আবাসন, শিল্পোন্নয়ন এবং জনসেবা কার্যক্রম আরও কার্যকরভাবে পরিচালিত করার জন্য দ্রুত Big Data Analytics এবং AI ভিত্তিক নগর তথ্য ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন করা।

৪.৮.৯. AI, Big Data এবং Machine Learning ভিত্তিক পূর্বাভাস মডেল ব্যবহার করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ট্রাফিক প্রবাহ, শিল্পোন্নয়ন, আবাসন চাহিদা, ভবিষ্যৎ বর্জ্য উৎপাদনের ধরণ এবং সামাজিক সেবার পরিকল্পনা আরও কার্যকর করা এবং Digital Twin প্রযুক্তি ব্যবহার করে নগর সম্প্রসারণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আন্তঃসংযোগ বিশ্লেষণ করা।

৪.৮.১০. সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করার জন্য অবৈধ ও ঝুঁকিপূর্ণ যানবাহন চিহ্নিত করে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।

৪.৮.১১. অপরাধপ্রবণ ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যক সিসি ক্যামেরা স্থাপন করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি জোরদার করা।

৪.৮.১২. শহরের ভাসমান জনগোষ্ঠী এবং যানবাহন চলাচল নিরীক্ষণের জন্য আধুনিক ট্র্যাকিং ও মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা।

৪.৮.১৩. একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও নিরাপদ নগর পরিবহন ব্যবস্থার জন্য নারী, শিশু, বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রতিবন্ধীসহ সকল শ্রেণির মানুষের চলাচল সুবিধা নিশ্চিত করতে 'ইউনিভার্সাল অ্যাকসেসিবিলিটি' ধারণার বাস্তবায়ন করা।

৪.৮.১৪. নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে Social Listening Tools এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে মতামত ও প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা।

৪.৮.১৫. Intelligent Citizen Platform, Virtual Town Hall Meetings ও Geo-tagged Citizen Feedback System চালুর মাধ্যমে নাগরিক সমস্যা সংগ্রহ ও দ্রুত সমাধান নিশ্চিত করা।

৪.৮.১৬. জরুরি সেবায় AI Chatbot ব্যবহার করে দ্রুত সেবা প্রদান এবং Blockchain প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

৪.৮.১৭. Intelligent Infrastructure Planning-এর মাধ্যমে IoT, AI, Big Data, 5G ও Edge Computing একীভূত করে দক্ষ নগর ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

৪.৮.১৮. IoT- -সক্ষম নতুন ভবন নির্মাণের মাধ্যমে ভবিষ্যতে জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

৪.৮.১৯. সাইবার নিরাপত্তায় Blockchain, AI-ভিত্তিক নজরদারি ও ডাটা এনক্রিপশন প্রযুক্তির ব্যবহার বিস্তৃত করা।

৫. উপসংহার:

দেশের টেকসই ও সুসমন্বিত উন্নয়নকে লক্ষ্য করে একটি সুপরিকল্পিত, ভারসাম্যপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নগরায়নের রূপরেখা নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে এই নীতিমালায় নগর ও গ্রামীণ এলাকার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ, অবকাঠামো উন্নয়ন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার সুস্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, নগর ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যা একটি বাসযোগ্য, নিরাপদ ও দক্ষ নগর ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলায় সহায়ক। বাংলাদেশের ভৌগোলিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে প্রণীত এই নীতিমালাটি যদি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, তবে তা দেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন, জলবায়ু সহনশীলতা অর্জন এবং নাগরিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

পরিশিষ্ট-ক

বাংলাদেশের শহরের শ্রেণিবিন্যাস (Urban Hierarchy)

(ক) মেগাসিটি:
জনসংখ্যা এক কোটি বা তার বেশি। এই শহরগুলো দেশে বৃহৎ পরিসরের প্রশাসনিক কার্যক্রম ও বহুস্তরবিশিষ্ট অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র। যেমন: ঢাকা।

(খ) মেট্রোপলিটন সিটি:
জনসংখ্যা ৫ লক্ষ থেকে ১ কোটির মধ্যে। এসব শহরে স্বতন্ত্র প্রশাসন, শিল্প, শিক্ষা ও ব্যবসার জোরালো উপস্থিতি থাকে। যেমন: চট্টগ্রাম, রাজশাহী।

(গ) সেকেন্ডারি টাউন বা জেলা শহর:
৫০,০০০ থেকে ৫ লক্ষ জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহর, যা জেলার সদর দপ্তর এবং আশপাশের উপজেলা ও গ্রামীণ এলাকার সেবা কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

(ঘ) টারশিয়ারি শহর বা উপজেলা টাউন:
জনসংখ্যা ২০,০০০ থেকে ৫০,০০০। প্রতিটি উপজেলার প্রশাসনিক ও সেবাকেন্দ্র হিসেবে কাজ করে এবং স্থানীয় অর্থনীতি ও সামাজিক পরিসেবার কেন্দ্র হয়।

(ঙ) উপশহর:
বড় শহরের আশপাশে অবস্থিত ছোট ছোট শহর বা বসতি। এগুলো আবাসন ও বাণিজ্যিক সম্প্রসারণে সাহায্য করে এবং বড় শহরের চাপ কমায়।

(চ) এগ্রোপলিস বা গ্রোথ সেন্টার:
পরিকল্পিত গ্রামীণ কেন্দ্র যা কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা হয়। এখানে কৃষিভিত্তিক শিল্প, বাজার, যোগাযোগ ও অন্যান্য সেবার ব্যবস্থা থাকে।

(ছ) পৌরসভা:
নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে গঠিত একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, যা সাধারণত সেকেন্ডারি বা টারশিয়ারি শহরে থাকে। এটি স্থানীয় সেবা, অবকাঠামো উন্নয়ন ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করে।